বিলায়েৎ খাঁ

অতুনশাসন মুখোপাধ্যায়

মানুষ বিলায়েৎ খাঁ এবং ওস্তাদ বিলায়েতৎ খাঁ

ওস্তাদ বিলায়েৎ খাঁ এর বছরের মার্চ মাসে গত হলেন। ভারতবর্ষের সংগীতের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক এখন কিংবদন্তি। সমালোচকদের অনেকের ধারণা কোনও বড় মাপের মানুষের কর্মকাণ্ডের যথার্থ মূল্যায়ন করতে হলে সেই ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে জানাশোনা বিশেষ কাজে আসে। যেমন রবীন্দ্রচরিত্র বিশ্লেষণ থেকেই ধারণা জন্মায় প্রথাগত শিক্ষার বাইরে শিক্ষা নিয়ে ভাবনা - চিন্তা অথবা ব্রহ্মচর্য আশ্রম প্রতিষ্ঠার তাগিদ স্কুল - পালানো বালক রবীন্দ্রনাথের চরিত্রের মধ্যেই শিকড় গেড়েছিল। একই রকম ভাবে ওস্তাদ বিলায়েৎ খাঁ সেতারে যে নিজস্ব স্টাইলতৈরি করেছিলেন যা তাঁর পিতামহ ইমদাদ খাঁর বাদন থেকে এবং তাঁর পিতা এনায়েৎ খাঁর বাদন থেকেও ভিন্ন শৈলীর, তার কারণ খুঁজতে গেলে বিলায়েৎ খাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে একটু ভাবতে হয়।

শিল্পী হিসাবে বিলায়ৎ খাঁর ব্যক্তিত্ব

ইমদাদ খাঁ সেতারে ঠুংরির সুর বাজাতেন না, কিন্তু এনায়েৎ খাঁ ঠুংরি বাজাতেন। অর্থাৎ ছোট বয়সেই একসময় বিলায়েৎ বুঝতে শিখলেন তাঁর পিতা নিজের বাজনার বাইরে কিছু স্বাধীনতা ভোগ করতে চেয়েছেন। অবশ্যম্বামী ফল যা হবার তাই হল। বিলায়েৎ পিতামহ ইমদাদ খাঁর ঘরানা ছাড়িয়ে পিতা এনায়েৎ খাঁর বাদনবৈশিষ্ট্য ছাড়িয়ে এক নতুন আলোর ঝর্ণাধারায় সিক্ত হয়ে তাঁর সেতার ঝঙ্কার তুললেন। সেখানে কণ্ঠসংগীতের অলঙ্কার, মুড়কি, গমক, তান সংযোজিত হল। তান দীর্ঘায়ত হল এবং সেই তান ফুটিয়ে তুলতে ছয় তারের সেতার তৈরি হল। ইমদাদা খাঁ, এনায়েৎ খাঁর ঘরানায় বিলায়েৎ যেটা করে বসলেন তার ফল হল এই, এ ঘরানায় এক নতুন বিলায়েতি স্টাইল বা সংগীতজগতের পরিচিত ভাষায় বিলায়েতিবাজ প্রতিষ্ঠিত হল এবং বাস্তব পরিস্থিতিটা হয়ে দাঁড়াল এমনই যে ইমদাদা খাঁর ঘরানা অনুসরণকারী হিসাবে পরিচিত বিলায়েৎ-পরবর্তী কোনও বাদকের পক্ষেই এই মুহূর্তে বিলায়েতকে ছাড়িয়ে বেশি দূর যাওয়াটা দূরূহ হয়ে পড়ল।

শুধু সেতারবাদক বা সরোদিয়ারাই বিলায়েতকে অনুসরণ করেছেন তাই নয়। একটু খেয়াল করলেই দেখাযাবে এ যুগের বহু নামি কণ্ঠসঙ্গীত শিল্পী মুড়কি, গমকের সঙ্গে দ্রুত গতির তান মিশিয়ে এবং রেগ, গম মগ, মপ মপ, পধ পধ ইত্যাদি জমজমার চালচিত্রে খেয়ালের বিলম্বিত অংশে প্রায়ই বিলায়েৎ খাঁর জোড় পর্যায়ের অনুসারী হন।

বিলায়েতিবাজ ব্যাপারটা কীরকম? এক কথায়, অত্যন্ত বিদগ্ধ, কুশলী বাজিয়ের কাঁধে নান্দনিক সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলার দায় অব্যর্থ ভাবে চাপিয়ে দিলে যে ফল বেরিয়ে আসে সে রকম একটা কিছু। বিলায়েৎ খাঁর মধ্যে বলাই বাহুল্য, এই দুই গুণের সার্থক সংমিশ্রণ ঘটেছিল। রাত্রি প্রথম প্রহরের রাগ থেকে শু করে গভীর রাতের প্রযোজ্য যে কোনও রাগেই তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল অসাধারণ। আবার সূর্যোদয়কালে তিনি যখন দিনের প্রথম প্রহরের রাগ বাজিয়েছেন, শ্রোতা পাগল হয়ে গেছে। সভায় অনুষ্ঠানে বেশির ভাগ সময়েই বিলায়েৎ যে সব রাগ উপহার দিয়েছেন, সেগুলো পূর্বাঙ্গের রাগ। তাঁর হ

াতে পূর্বাঙ্গের রাগগুলো প্রকৃতই সজীব হয়ে উঠত। তাঁর মধ্যে এমন নতুন কিছু ছিল যা সবার বাজনা থেকে বেরয়নি। এই নতুনত্ব সৃষ্টির পিছনের কারণ খুঁজতে বিলায়েতের সচেতন শিল্পীসত্তার দিকে তাকিয়ে দেখতে হয়।

অহম্‌বোধসম্পন্ন বিলায়েৎ খাঁর সচেতন শিল্পীসত্তা

আর পাঁচজন শিল্পীর থেকে কিছু আলাদা ছিলেন। তাঁর এমন একটা ব্যক্তিত্ব ছিল যেখানে 'অহম্' ব্যাপারটা নিষ্প্রভ তো নয়ই বরং তাঁর আচারে ব্যবহারে মাঝে মধ্যে একটা অহমিকা প্রকাশ পেত---এ রকম একটা ধারণাও করা যেতে পারে। অর্থাৎ তাঁর আচারে ব্যবহারে বিলায়েতি স্টাইলটা সব সময়ই উচচকিত থাকত। যৌবনে বিলায়েৎ ঝালাপর্বে ঝড়ের গতিতে বাজাতে পছন্দ করতেন স্রেফ লোককে তাক লাগিয়ে দেবার জন্য। অন্য ওস্তাদের সঙ্গে বাজাতে বসে তাকে গতিতে পরাস্ত করে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার প্রয়াস, অথবা বিখ্যাত তবলিয়াকেদু'আঙুলে বাজিয়ে তার সঙ্গে টক্কর দেবার প্রকাশ্য আহ্বান জানানো ওস্তাদ বিলায়েৎ খাঁর অহমিকারই প্রকাশ-- এতেকোনও সন্দেহ নেই। তবে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সুরমাধুর্যের অন্দরমহলে যতই আরও বেশি প্রবেশ করতে থাকেন যৌবনের এই উচছলতাও ততই কমতে থাকে।

জি ডি বিড়লা সভাগৃহে বিলায়েৎ খাঁর স্মরণসভায় তাঁর দীর্ঘদিনের সঙ্গী এবং শিষ্য অরবিন্দ পারেখের স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায় বিলায়েৎ খাঁ ভাল সাঁতার কাটতে পারতেন, ঘোড়ার চড়তে ভালবাসতেন এবং সেতারবাদনে যতটা খুঁতখুঁতে ছিলেন ঠক ততটাই ছিলেন নিজের জন্য গাড়ি নির্বাচনে। বিলায়েৎ খাঁর ভাই ওস্তাদ ইমরাত খাঁরপুত্র ওস্তাদ ওয়াজাহাত খাঁর খবরের কাগজে প্রকাশিত বিবৃতি থেকে জানা যায় এক সময়কার প্রগাঢ় ভ্রাতৃত্ববন্ধনে জড়িয়ে থাকা বিলায়েৎ এবং ইমরাত খাঁর মধ্যে গত পাঁচ বছর বাক্যালাপের সম্পর্ক ছিল না। অরবিন্দ পারেখ এবং ওয়াজাহাত খাঁর মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য থেকে এটুকু অনুমান করতে বোধ হয় অসুবিধা হয় না বিলায়েৎ খাঁ মানুষ হিসাবেতেমন একটা আপনভোলা সাধুসন্তগোছের ছিলেন না, বরং তাঁর পরিপার্শ্ব সম্বন্ধে যথেষ্টই সচেতন ছিলেন। তা হলে একটা যে প্রচলিত ধারণা আছে সংগীতের উচচসোপানে আরোহন করেন যে শিল্পী, তিনি আর পাঁচজনের থেকে আলাদা উচচতর কোনও মার্গে বিচরণ করেন বিলায়েৎ সেই প্রচলিত নিয়মটা ভাঙলেন কীভাবে? এক কথায় এর উত্তর হয়ত দেওয়া সম্ভব নয়। তবে এ কথাটা বোধহয় মেনে নেওয়া যেতে পারে, ব্যক্তিগত জীবনের বহু ক্ষেত্রে প্রতিটি খুঁটিনাটি যেমন ছিল তাঁর বিচার্য, বাজনার ক্ষেত্রেও সুরের প্রতিটি টান তাঁর খুঁটিনাটি বিচারের পর্যায় অতিক্রম করে তবেই প্রকাশিত হতে পারত। সেখানে রাগের রূপ বা নান্দনিকতার গুত্ব যতটা, শ্রোতার কান বা শ্রোতার তৃপ্তিব্যাপারটাও ছিল ততটাই প্রয়োজনীয়। অর্থাৎ উপস্থাপক হিসাবে বিলায়েৎ খাঁ ছিলেন অতিমাত্রায় সচেতন। আরও বুঝিয়ে বলতে গেলে তথাকথিত সাধুসন্ত মনোভাবাপন্ন আত্মমগ্ন শিল্পী নিজের চি মতো সুরসৃষ্টি করে তাঁর সাধনকর্ম সম্পন্ন করার তৃপ্তি পেতে পারেন, শ্রোতার দিকে তাকিয়ে দেখার তেমন কিছু দায় তাঁর না নিলেও চলে। হয়তবা সে দায় নেবার বাস্তব পথও তাঁর পক্ষে সুগম নয়। কিন্তু বিলায়েৎ খাঁ তুলনায় অনেক ধাপ এগিয়ে রয়েছেন। তাঁর অন্তরের সুর আর শ্রোতার পক্ষে সুখশ্রাব্যতা এই দু'য়ের মধ্যে তিনি সেতুবন্ধন করতে জানেন, কারণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে তিনি আত্মবিস্মৃত নন, তিনি ভাবের মাত্রা এবং তার বাহ্যিক প্রয়োগ সম্বন্ধে অতিমাত্রায় সচেতন এবং অনুভূতিপ্রবণ।

কণ্ঠসংগীতের প্রতি দুর্বলতা

সম্ভবত এখান থেকেই কৌতুহল উঠে আসে সেতার বাজাতে বসে প্রায়ই তিনি গান গাইতেন কেন। যে বন্দিশ গেয়ে শোনাতেন সেটাই পরমুহূর্তে অবিকল সেতারে তুলতেন। গান না গেয়ে শুধু সেতার বাজিয়ে শোনালে কী অসুবিধা ছিল? বিলায়েৎ খাঁ নিশ্চয়ই এমন নামজাদা কণ্ঠসংগীতশিল্পী ছিলেন না যে শ্রোতা তাঁর সেতারবাদনে তৃপ্তনা থেকে তাঁর গানেরও প্রত্যাশী হয়ে থাকত। তাহলে গান গাওয়া কেন? অনুমান করা যেতে পারে, বিলায়েৎ শ্রোতাকে তাঁর ভিতরের সুরের আবেগটার হদিশ দিতে আগ্রহী ছিলেন। কণ্ঠসংগীতে যে মস্ত একটা যাদু আছে সে কথাটা বোধহয় বিলায়েতের ভাল মতো উপলব্ধ হত। ১৯৩৮ সালে এনায়েৎ খাঁ যখন মারা যান বিলায়েৎ তখন মাত্র এগারো বছরের বালক। এরপর একদল কণ্ঠসংগীত শিল্পীর তত্ত্বাবধানে বিলায়েতের শিক্ষা চলতে থাকে যাঁদের মধ্যে ছিলেন মতামহ ওস্তাদ বন্দে হোসেন খান, মামা জিন্দা হোসেন এবং কাকা ওয়াহিদ খান। বিলায়েৎ খাঁর গায়কি অঙ্গে সেতারবাদন খুব সম্ভব এই কণ্ঠসংগীত শিল্পীদেরই প্রভাবে। পরবর্তীকালে আগ্রা ঘরানার ফৈয়াজ খাঁর গুগম্ভীর গমক, কিরানা ঘরানার আবদুল করিম খানের সূক্ষ্ম কাজ, বড়ে গোলাম আলির পাতিয়ালা ঘরানার তানবৈচিত্র্য এবং আত্মীয় আরি খাঁর বন্দিশের শৈলী বিলায়েতের গায়কি অঙ্গে

নতুন মাত্রা যোগ করে। কণ্ঠসংগীতের অলঙ্কারসমূহ যেমন মীড়, গমক, দ্রুতলয়বিশিষ্ট সরল ও ছোট তান যাকে গিটকিরি বলা হয়, এক যোগে এবং একই ঝোঁকে নির্দিষ্ট সংখ্যক স্বরসমূহের উচচারণ রীতি যাকে সংগীতের ভাষায় বলা হয় আশ, এ ছাড়া সাপট তান, একহারা তান এবং ছুট তান বিলায়েতের বুকের ভিতরে হয়ত সব সময়ই তাঁর কণ্ঠসংগীত শিল্পীসত্তা নাড়া দিতে থাকত। তারই সামান্য বহিঃপ্রকাশ গানের মধ্য দিয়ে ঘটিয়ে অতঃপর সেতারের সুরঝঙ্কারে তার বিস্তৃতি ঘটিয়ে বিলায়েত সম্ভবত তাঁর সুরের আবেগের সঙ্গে শ্রোতার কানের যোগসূত্র স্থাপনে প্রয়াসী হতেন। হয়ত এই কণ্ঠসগীতের অ াবেগের প্রাবল্যই ষড়্জ-পঞ্চ মের সেতার বাদ দিয়ে তাঁকে গান্ধার - পঞ্চ মের সেতার সৃষ্টির দিকে প্রবৃত্ত করেছিল।

কণ্ঠসংগীত অভ্যাস বা পরিবেশনে তানপুরার অপরিসীম গুত্বের কথা বলার প্রয়োজন নেই। চার তারেরসচরাচর ব্যবহৃত তানপুরায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় জুড়ির তার ছাড়া প্রথম তারটি মন্দ্রপঞ্চ মে এবং চতুর্থ তারটি মন্দ্রষ্ড়জে বাঁধা হয়। পঞ্চম বর্জিত রাগে প্রথম তারটি মন্দ্র - মাধ্যমে মেলানো হয়। তানপুরা ঠিক ঠিক সুরে মেলাতে পারলেমন্দ্র - ষড়্জের তার থেকে গান্ধার স্বর স্পষ্ট ভেসে আসে। এই গান্ধার স্বরের পরিচিতি "স্বয়ম্ভূ গান্ধার" হিসাবে। কণ্ঠসংগীতের গুণী শিল্পীর কানে স্বয়ম্ভু গান্ধারের উপস্থিতি নিতান্ত প্রয়োজনীয়। বিলায়েত খাঁর শিল্পীসত্তার যে ভাগ অবিরত তাঁর বুকের ভিতর কণ্ঠসংগীতের মূর্ছনার ঢেউ তুলত হয়ত তারই প্রেরণায় তিনি গান্ধার-পঞ্চ মের সেতার সৃষ্টিকরেছিলেন। শুদ্ধ গান্ধারযুক্ত রাগে তাই প্রত্যেকটি স্ট্রোকে জুড়ি আর পঞ্চ মের সঙ্গে তিনি তাঁর সেতারে যে গান্ধারস্বরকে স্পষ্টভাবে পেতেন মনে হয় কণ্ঠসংগীতপ্রেমী সেতারি বিলায়েৎ সেই সুরমণ্ডলের মোহে বাড়তি শক্তি পেয়ে যেতেন। এই ভাবেই বিলায়েৎ প্রথম তাঁর মেজাজটাকে সুরের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে তার পর শ্রোতার মন জয় করার নতুন একটা পথ আবিষ্কার করেছিলেন অনুমান করা যায়। বলা বাহুল্য বিলায়েৎ খাঁ মানুষটা আর পাঁচজনের থেকে বেশি আত্মসচেতন না হলে সেই আত্মসচেতনতার এমন একটা ইতিবাচক ফলশ্রুতিও অনুপস্থিত থাকতে পারত। শ্রোতার কাছে সেটা হয়ত হয়ে দাঁড়াত এক অভাবিত অজ ানা অধ্যায়।

রাগসৌষ্ঠব ও স্বেচ্ছাচার

একটা পুরনো প্র্ন, হিন্দুস্থানি রাগসংগীতে ভাব ফুটিয়ে তোলার প্রয়োজনবোধে রাগরূপ রক্ষা করার ব্যাপারে শিল্পী কতটা স্বাধীনতা ভোগ করতে পারেন? পাশ্চাত্য মার্গসংগীতের তুলনায় ভারতীয় রাগসংগীতে শিল্পীর স্বাধীনতা অনেক সীমিত। যদিও বিশুদ্ধ রাগের মধ্যে আবদ্ধ থেকেও স্বর আর শ্রুতির বিন্যাস ও সংমিশ্রণ ঘটিয়ে এক একটি রাগের যে ব্বি তৈরি হতে পারে তার ব্যাপকতা সুবিশাল, তবু রাগসংগীতে সুরস্রষ্টার স্বাধীনতার ব্যাপ্তি আসলে 'সীমার মাঝে অসীম'। অসীমত্বের প্রেমে পড়ে সীমাকে লঙঘন করেছেন বিলায়েতের বিদ্ধে এই অভিযোগ হেনে কোনও কোনও সমালোচকের ভ্রূকুঞ্চিত হয়েছে বহুবার। গান্ধার, বৈধত এবং নিষাদের শুদ্ধ এবং কোমল সুর একই রাগে প্রতিস্থাপন করে বহু স্বরের ভিড়ে তিনি র াগরূপ হারিয়ে ফেলেছেন এমন অভিযোগও উঠেছে। একটা কথা ভুললে চলবে না। ভারতীয় সংগীতের মাতৃসদৃশ হল জা তি এবং জাতিগায়নের ফল হল রঞ্জকতা, রস ও ভাবের সৃষ্টি। এই জাতি শুদ্ধা হতে পারে আবার সংসর্গজ বিকৃতা হতে পারে। গান্ধারোদীচ্যবা, নন্দয়ন্তী, গান্ধারপঞ্চ মী, কার্মারবী, কৈশিকী ইত্যাদি বিকৃতা জাতিগায়ণ - কালে কোমল ও শুদ্ধস্ বরের সহাবস্থানে ্য বহু স্বরের সমকালীন উপস্থিতিতে বীররস, শৃঙ্গবীররস, বীভৎসরস, অদ্ভুতরস সৃষ্টি হতে পারে ---ভ ারতীয় সংগীতশাস্ত্রে এর সমর্থন পাওয়া যায়। আমাদের পরিচিত রাগ-রাগিনী যখন এই জাতি থেকেই উদ্ভূত তখন নিজসৃষ্টি রাগের মোড়কে বিলায়েৎ খাঁ সাধারণপ্রচলিত রীতি ছাপিয়ে বহু স্বরের সহাবস্থান ঘটালে তাঁর বিদ্ধে রাগরূপ ফুটিয়ে তুলতে ব্যর্থ হবার অভিযোগে তোলা আসলে প্রচলিত গোঁড়া মনোভাবেরই প্রকাশ। রাগ হতে হবে ঔড়ব, ষাড়ব ব া সম্পূর্ণ এবং সাতটির বেশি স্বর দিয়ে রাগ রচিত হবে না - এমন কিছু কিছু ধারণা রাগলক্ষণের নামে চলে আসছে। ঔড়বের নীচে রাগের প্রচলন সাধারণ ভাবেই নেই, কিন্তু ইদানীং দক্ষিণ ভারতের শিল্পীদের কণ্ঠে চারস্বরবিশিষ্ট রাগ পরিবেশিত হতে শোনা যাচ্ছে। আবার একই রাগে বড় বড় পণ্ডিত আর ওস্তাদরা ভিন্ন ভিন্ন স্বর প্রয়োগ করে আসছেন-- এমন দৃষ্টান্তও তো অজস্র। একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার হয়। তিলককামোদ ষাড়ব-সম্পূর্ণ জাতির এমন একটা রাগ যাতে সব স্বর শুদ্ধ ব্যবহার করা হয়। বিশেষত কোমল নিষাদ বর্জন করার রীতি দেশ এবং সুরট রাগের থেকে একে আলাদা করার জন্য। কিন্তু দুই নিষাদই সার্থকভাবে ব্যবহার করেছেন কোনও কোনও গুণী শিল্পী। তিলককামে াদের বিশেষ বহুগতি বজায় রেখে রাগলক্ষণ এঁরা নষ্ট হতে দেননি। বলাই বাহুল্য, রাগসংগীতের মহাভারত তাতে অশুদ্ধ

তো হয়ইনি বরং সমৃদ্ধ হয়েছে। অন্য স্বর বা বাড়তি স্বর রাগে প্রতিস্থাপনের এই পরীক্ষা বহুকাল থেকেই চলে আসছে। বিলায়েৎ খাঁ যা করতে চেয়েছেন সেটা যদি তাঁর একটা উটকো পরীক্ষা বলে ধরে নেওয়া হয় তাহলে সঙ্কীর্ণ রাগ হিসাবে পরিচিত "পিলু" কি বর্জনীয়? পিলুতে বারোটি স্বরেরই ব্যবহার লক্ষণীয়। মানুষটা যেহেতু ওস্তাদ বিলায়েৎ খাঁ প্রতিবাদী ও নির্ভীক বিলায়েৎ খাঁ তাঁর পরীক্ষাটা নতুন এবং প্রথাসিদ্ধ পথের বাইরে হবে এতে আশ্চর্য হবার কী আছে! একটা কথা ভাবা দরকার প্রথাভঙ্গ করা যদি দোষের হয় তাহলে রাগসংগীতে প্রচলিত অর্থে স্বররূপই সব হয়ে দাঁড়ায়, ভাবরূপের কোনওই গুত্ব থাকে না। রবীন্দ্রনাথের একটি মন্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে এই তর্ক শেষ করা যেতে পারে--- 'সংগীতবেত্তাদিগের প্রতি আমার এই নিবেদন যে কী কী সুর কীরূপে বিন্যাস করিলে কী কী ভাব প্রকাশ করে, আর কেনই বা তাহা প্রকাশ করে তাহার বিজ্ঞান অনুসন্ধান কন। মূলতান, ইমনকল্যাণ, কেদারা প্রভৃতিতেকী কী সুর বাদী আর কী কী সুর বিসম্বাদী তাহার প্রতি মনোযোগ না করিয়া দুঃখ, সুখ, রোষ বা বিস্ময়ের রাগিনীতেকী কী সুর বাদী ও কী কী সুর বিসম্বাদী তাহাই আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হউন।' (সংগীত ও ভাব)।

সম্মান ও সমীহের দাবিদার

র চারিত্রিক স্বাতন্ত্র্য তাঁকে সংগীতের নতুন রসধারায় শ্রোতার প্রাণমন ভরিয়ে তুলতেই যে কেবল সাহায্য করেছিল তাই না, সামাজিক ভাবে তাঁকে প্রতিবাদী প্রবল আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন মানুষ হিসাবেও উপস্থাপিত করেছিল। শিল্পী এবং স্রষ্টা হিসাবে তাঁর প্রাপ্য তিনি পাচ্ছেন কিনা এই ব্যাপারে তিনি খুব বেশি অনুভূতিপ্রবণছিলেন। পণ্ডিত রবিশঙ্করকে কোনও এক অনুষ্ঠানে যে সম্মানী দেওয়া হয়েছিল তিনি তার থেকে এক টাকা বেশি দাবি করেছিলেন এ কথাই প্রমাণ করতে যে শিল্পী হিসাবে তাঁকে ছোট করে দেখা যাবে না। পদ্মশ্রী এবং পদ্মবিভূষণ খেতাব নিজে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং পণ্ডিত রবিশঙ্করকে ভারতরত্ন উপাধি দেওয়া সময় তাঁর মনের অসন্তোষ গোপন রাখেননি। সরকারি আমলা এবং মন্ত্রীদের সংগীতের বিচারে অংশগ্রহণ করা ভাল চোখে দেখতেন না।

সংগীতসভায় তিনি যখন বাজাতেন, শ্রোতাদের মধ্যে অতিরিক্ত কথাবার্তা বা ফিসফাস চলতে থাকলে বিলায়েৎ খাঁ অসন্তোষ প্রকাশ করতেন। এমন ক্ষেত্রে তিনি সেতার নামিয়ে রেখেছেন এ রকমও শোনা গেছে। স্বভাবে তিনি নিয়মনিষ্ঠ ছিলেন। আবার সমঝদার শ্রোতা পেলে তাঁর বাজনাও খুলে যেত। শ্রোতার মনের মধ্যে নিজের মনের আবেগ সঞ্চারিত করতে যাঁর ছিল সজাগ দৃষ্টি সেই বিলায়েৎ খাঁ উল্টোদিক থেকেও কিছু প্রত্যাশা করতেন। সেটা সম্মান ও সমীহ প্রাপ্তির প্রত্যাশা।

বাংলার বিশেষ ক্ষতি

র বংশের শিকড় যদিও ছিল উত্তরপ্রদেশের এটাওয়ায়, ইমদাদ খাঁ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে কলকাতায় এসে তারাপদ ঘোষের কাছে শিক্ষা শু করেন। তাঁর পুত্র এনায়েৎ খাঁ সভাসংগীতজ্ঞ থাকার সূত্রে বিলায়েৎ পূর্ববঙ্গের গৌরীপুরে ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরির বাড়িতে জন্ম নেন। পার্ক সার্কাসের স্কুলে পড়েছেন। কলকাতা এবং বাংলার লোক বলে নিজের পরিচয় দিতেন। বাংলায় তাঁর অসংখ্য শিষ্য, অনুরাগী এবং ভক্ত। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য তাঁর সংগীতাশ্রম গড়ে তোলার জন্য এক খণ্ড জমির ব্যবস্থা করে দেওয়ায় বাংলার সংগীতপ্রেমী মানুষজন খুশি হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরে সেই সংগীতাশ্রম আদৌ আর হবে কিনা এ ব্যাপারে তাঁর পরিবারের সভ্যরাই সন্দিহান। ফলত বাঙালির মনে বিলায়েৎ খাঁ এক বিশাল শূন্যতা রেখে দিয়ে চলে গেলেন। সংগীতের অন্যতম এই জ্যোতিষ্ক তাঁরই শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী গোবরা কবরস্থলে পিতা এনায়েৎ খাঁর কবরের পাশে শায়িত রয়েছেন। তাঁর সাধের বাংলা তথা কলকাতার মাটিতে নিজের মৃতদেহ মিশিয়ে দিতে চেয়েছেন আফ্তাব-ই-সিতার।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com